Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 17-25
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0728

সেভার্স ও লুজান চুক্তি: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা
[Treaty of Sevres and Lausanne: A Comparative Review]

শাহনাজ সুলতানা*

Abstract

The treaties of Sevres and Lausanne hold immense significance in the history of Turkey. After World War I, the victorious Allied Powers imposed a humiliating treaty – the treaty of Sevres – on defeated Turkey, which left the country cornered in geographical, political, economic and military terms. In this extremly difficult time for Turkey, Mustafa Kemel Pasha emerged as a savior. Under his leadership, the Turkish nationalist forces rejected the treaty of Sevres and began a movement, which eventually led the Allied Powers, under changing circumstances, to sign the comparatively lenient treaty of Lausanne with Turkey. This was a compromise agreement between the two parties. As a result of this treaty, Turkey was saved from humiliation and disgrace, its rightful claims were realized, and its independence and sovereignty were recognized. The Allied Powers' diplomacy suffered a defeat and nationalist government dominance was established in Turkish–populated regions. Upon the ruins of the decaying Ottoman Empire, the modern Republic of Turkey was built.

***Keywords*:** World war I, Ottoman empire, Allied powers, Turkey, Mustafa Kemel Pasha, Treaty of Sevres, Treaty of Lausanne.

ভূমিকা

১৯২০ সালের সেভার্স চুক্তি ও ১৯২৩ সালের লুজান চুক্তি তুরস্কের ইতিহাসে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উভয় চুক্তিই তুরস্ক বনাম মিত্রপক্ষীয় চুক্তি। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে পরস্পর বিরোধী এ চুক্তিদ্বয়ের প্রথমটির দ্বারা 'ইউরোপের রুগ্ন মানব' তুরস্ক নিজের অস্তিত্ব মিত্রশক্তির কাছে বিলিয়ে দেয়; পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি বা লুজান চুক্তির দ্বারা বীরধর্মী তুর্কিরা সেই অপমান আর গ্লানি থেকে নিজেদের মুক্ত করে রুগ্ন তুরস্ককে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। মূলত সেভার্স চুক্তি ছিল মিত্রশক্তির হাতের পুতুল ক্ষমতালোভী সালতানাত গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চুক্তি আর লুজান চুক্তি ছিল বিপ্লবী তুর্কি জাতির মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার চুক্তি।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বিজয়ে, আর তার পতন পরাজয়ে। ১২৮৮ সালে উসমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উসমানীয় বংশ ও সালতানাত ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ছয় শতাব্দীর অধিককাল স্থায়ী হয়। উসমানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের আমলে কালক্রমে এ সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তৃত হয়ে অতি দ্রুত তাদের ক্ষমতার পরিধি সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। তবে পরবর্তীতে দুর্বল ও অযোগ্য শাসকদের সময় এ অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয় এবং সাম্রাজ্যের গৌরব ক্রমাগতভাবে ম্লান হয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার তার দুর্বলতার কারণে থমকে দাঁড়ায়। এই স্থবিরতা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে পশ্চাদপসরণে পর্যবসিত হয়।[১] বৃহৎ শক্তিবর্গ বুঝতে পেরেছিল যে, উসমানীয়রা তাদের সাম্রাজ্যের পূর্ব শক্তি হারিয়েছে এবং এবার তাদের পুনর্দখলের পালা।

* Professor, Department of Islamic History and Culture, University of Rajshahi, Rajshahi 6205, Bangladesh; E-mail: shahnajsultana@ru.ac.bd

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অঞ্চলগুলো একের পর এক তাদের হাতছাড়া হতে থাকে। বিশেষ করে প্রথম বলকান যুদ্ধে (১৯১২) উসমানীয়দের পরাজয়ের পর বৃহৎ শক্তিবর্গ ১৯১৩ সালে লন্ডন সম্মেলনে উসমানীয়দেরকে তাদের সমগ্র বিজিত ইউরোপীয় অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও উসমানীয় সাম্রাজ্য

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংকট এবং বলকান যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে উসমানীয়রা যখন বিপর্যস্ত ঠিক সে সময় নানাবিধ কারণে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় শক্তি ও মিত্রশক্তি নামে দুটি বড় জোট গঠিত হয়।[৩] প্রথম জোটে ছিল মূলত চারটি দেশ–জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া ও উসমানীয় সাম্রাজ্য। আর দ্বিতীয় জোটে ছিল প্রধানত ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া।[৪] ইতালি প্রথমে জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি চুক্তি বলয়ে আবদ্ধ হলেও বিভিন্ন প্রাঙ্গণে যুদ্ধের ব্যর্থতায় ১৯১৫ সালের মে মাসে মিত্রশক্তির পক্ষে সরে আসে।[৫] জাপান, চীন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশও শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। এ সময় উসমানীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল নব্য তুর্কি সরকার। আর সুলতান ৫ম মুহম্মদ ছিলেন সম্পূর্ণরূপে একজন তুচ্ছ ব্যক্তি, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল যুদ্ধমন্ত্রী এনভার পাশার হাতে।[৬] যুদ্ধের শুরুতে উসমানীয় সাম্রাজ্য নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং নব্য তুর্কি নেতাদের উৎসাহ ও প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্য যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয় এবং জার্মানি তথা কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষাবলম্বন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে যোগদান করে উসমানীয় সাম্রাজ্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয়ের ফলশ্রুতিতে তুর্কিদেরও পরাজয় ঘটে। ১৯১৮ সালের শেষ দিকে 'ইউরোপের রুগ্ন মানব' অবশেষে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।[৭] প্রতিটি ফ্রন্টে পরাজিত তুর্কিদের পক্ষে যুদ্ধ বিরতি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ইতোমধ্যে সুলতান ৫ম মুহম্মদের মৃত্যু হলে তার ভাই ৬ষ্ঠ মুহম্মদ ওয়াহিদউদ্দীন ১৯১৮ সালের ৩ জুলাই সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সেটা ছিল তুরস্কের ইতিহাসে সবচেয়ে সংকটপূর্ণ কাল।[৮] অক্টোবর মাসে নব্য তুর্কি মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে সুলতান নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন আহমদ ইজ্জত পাশাকে, যার কাজ ছিল যুদ্ধ বিরতির চেষ্টা করা।[৯] প্রাথমিক আলোচনার তিন দিন পর, ১৯১৮ সালের ২৯ অক্টোবর একটি তুর্কি প্রতিনিধি দল নৌমন্ত্রী রউফ বে-র নেতৃত্বে লেম্‌নস্ দ্বীপের মুদ্রস বন্দরে নোঙর করা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এইচ. এম. এস. আগামেম্‌নন-এ যান এবং পরদিনই (৩০ অক্টোবর, ১৯১৮) মিত্রশক্তির সাথে এক যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।[১০] এ চুক্তির পর পরই নব্য তুর্কি নেতা তালাত, এনভার ও জামাল একটি জার্মান গানবোটযোগে কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করে পালিয়ে যান।[১১]

সেভার্স চুক্তির পটভূমি

১৯১৮ সালের ৮ ডিসেম্বর মিত্রশক্তি তুর্কি রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপলে সামরিক শাসন জারি করে এবং শাসনযন্ত্রের সর্বত্র তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সুলতান ৬ষ্ঠ মুহম্মদ ২১ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং তার ভগ্নিপতি দামাদ ফরিদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।[১২] সুলতান ও তার ঘনিষ্ঠজনরা মনে করেছিলেন যে, মিত্রশক্তির সাথে সহযোগিতা করলে বিজিত উসমানীয় সাম্রাজ্যের কিছু অংশ অন্তত রক্ষা করা যাবে এবং সুলতানী শাসন বজায় থাকবে। কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ মিত্রশক্তি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক অগ্রসর হয়।[১৩] পূর্বে সম্পাদিত গোপন চুক্তির আলোকে মিত্রশক্তি বিভিন্ন শক্তিকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করার অনুমতি প্রদান করে। এ অনুমতির ভিত্তিতে গ্রিক বাহিনী ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফরাসি নৌবাহিনীর সাহায্যে ১৯১৯

সালের ১৫ মে স্মার্ণা এলাকায় অবতরণ করে এবং তুর্কিদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়।[১৪] এ চরম দুর্দিনে তুর্কি জাতীয়তাবাদী জনগণ মিত্রশক্তি ও তাদের হাতের পুতুল দুর্বল সুলতানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। পূর্ব আনাতোলিয়ায় এ আন্দোলন জোরদার হয়। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটও আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনকে দমন করার জন্য সুলতান তার সেনাপতি মুস্তফা কামাল পাশাকে সামরিক ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে পূর্ব আনাতোলিয়ায় পাঠান। ১৯১৯ সালের ১৯ মে কামাল কৃষ্ণসাগরীয় বন্দর সামসুনে অবতরণ করে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৫] তিনি আন্দোলনের প্রকৃতি দেখে আন্দোলনকারীদের সাথে যোগ দেন এবং একে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেন। কামালের নেতৃত্বে এ আন্দোলন তুর্কি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ দামাদ ফরিদ পাশার মন্ত্রীসভাকে দেশের দুরবস্থার জন্য দায়ী করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন একটি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য সুলতানের কাছে দাবি জানায়। তাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে সুলতান ১৯১৯ সালের শেষের দিকে নির্বাচনের আদেশ দিলে জাতীয়তাবাদী দলের অধিকাংশ সদস্যই জয়লাভ করে। ১৯২০ সালের ২৮ জানুয়ারি আলী রেজার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভা কামালের 'জাতীয় চুক্তি' (National Pact) অনুমোদন করে।[১৬] জাতীয় চুক্তি তুরস্কের স্বাধীনতার দলিল। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আধুনিক তুর্কি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্ধমান সাফল্য মিত্রশক্তিকে উদ্বিগ্ন করে। ফলে মিত্রশক্তি তুর্কি রাজধানীতে পূর্ণ সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ জেনারেল মিলান চল্লিশ জন জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেফতার করে মাল্টায় নির্বাসন দেন।[১৭] অবশিষ্ট নেতারা আঙ্গোরাতে গিয়ে কামালের সাথে মিলিত হন। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কামাল আঙ্গোরাতে 'জাতীয় মহাসংসদ' (Grand National Assembly) নামক পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন ডাকেন। এভাবে আঙ্গোরাতে সমান্তরাল সরকার গঠিত হয়।[১৮]

সেভার্স চুক্তি

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে আয়োজিত ফ্রান্সের প্যারিস শান্তি সম্মেলনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রপক্ষ পরাজিত পক্ষের উপর কতিপয় চুক্তি চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। চুক্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জার্মানির সাথে ভার্সাই সন্ধি (২৮ জুন, ১৯১৯), অস্ট্রিয়ার সাথে সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯), বুলগেরিয়ার সাথে নিউলির সন্ধি (২৭ নভেম্বর, ১৯১৯), হাঙ্গেরির সাথে ট্রিয়াননের সন্ধি (৪ জুন, ১৯২০) এবং তুরস্কের সাথে সেভার্স চুক্তি (১০ আগস্ট, ১৯২০)। তবে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে তুরস্কের সাথে শান্তি চুক্তির (সেভার্স চুক্তি) ব্যাপারে মিত্রশক্তির মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় প্যারিসে সুলতানের প্রেরিত প্রতিনিধি দলের প্রধান তৌফিক পাশা শান্তির শর্তাবলি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিপন্থী মনে করে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী দামাদ ফরিদ পাশা নিজেই প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে মিত্রশক্তির সাথে আলোচনায় বসেন এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরও তা ফলপ্রসূ হয়নি। অতঃপর কামালের নেতৃত্বে আঙ্গোরা সরকার যখন তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল সেসময় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং মধ্য আনাতোলিয়ায় কী ঘটছে সেদিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে মিত্রশক্তি সান রেমো[১৯] (San Remo) -তে মিলিত হয় (২৬ এপ্রিল, ১৯২০) এবং তুর্কি শান্তি চুক্তির শর্তাবলি নির্ধারণ করে, যা 'সেভার্স চুক্তি' নামে পরিচিত।[২০] প্রকৃতপক্ষে সান রেমোতেই চুক্তির খসড়া তৈরি করা হয় এবং সেভার্সে শুধু স্বাক্ষর করা হয়।[২১] ১১ মে চুক্তির শর্তাবলি উসমানীয় প্রতিনিধিদের পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়। এ শর্তাবলি শুধু উসমানীয় সাম্রাজ্যকে নয়, বরং গোটা তুর্কি জাতি ও মাতৃভূমিকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে প্রণীত হয়েছিল। কামালের নেতৃত্বাধীন তুর্কি জাতীয় উচ্চ পরিষদ সরকার সাথে সাথে এর বিরোধিতা করে।[২২] এমনকি উসমানীয় সুলতানের পুতুল সরকারও

চুক্তির শর্তাবলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য আগ্রহী শক্তির চাপে নতি স্বীকার করে ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট এত স্বাক্ষর করে।[২৩] ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের সন্নিকটে সেভার্স শহরে মিত্রশক্তি এবং সুলতানী সরকারের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে সেভার্স চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সেভার্স চুক্তির শর্তাবলি

সেভার্স চুক্তি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরূপ। এ চুক্তিতে ৪৩৩টি ধারা ছিল।[২৪] নিচে এর প্রধান শর্তাবলি আলোচনা করা হলোঃ

(ক) রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপলের উপর তুরস্কের কর্তৃত্ব খর্ব করা হবে না। তবে সেভার্স চুক্তি ভঙ্গ করলে বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যর্থ হলে মিত্রশক্তি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রণালী এবং মর্মরা সাগর যে কোন জাতির যে কোন প্রকার জাহাজের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং তা নিশ্চিত করতে একটি আন্তর্জাতিক "প্রণালী কমিশন" গঠিত হবে।

(গ) স্মার্ণায় গ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

(ঘ) পূর্ব আনাতোলিয়া, যার মধ্যে এরজেরুম, ভান, ত্রেবিজন্দ, বিত্‌লিস ও এরজিনজান প্রদেশ রয়েছে, তা একটি স্বাধীন আর্মেনিয়ান রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে এবং সীমান্ত নির্ধারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করবে। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকবে।

(ঙ) তুরস্ক আরব প্রদেশগুলোর উপর সব দাবি ত্যাগ করবে।

(চ) সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া স্বাধীন হবে তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে দুটো বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ থাকবে। এছাড়া ব্যালফোর ঘোষণা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলবে।

(ছ) তুরস্ক হেজাজের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিবে।

(জ) মিশর ও সুয়েজ খালের ক্ষমতা ব্রিটেনের উপর বর্তাবে।

(ঝ) সাইপ্রাসের উপর ব্রিটেনের দাবি তুরস্ক মেনে নিবে।

(ঞ) ইমব্রস ও তেনেদস দ্বীপ এবং ইজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপ গ্রিসের অধীনে এবং ইজিয়ান সাগরের দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ ইতালির অধিকারে যাবে।

(ট) তুরস্কে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বাতিল করা হবে। সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি হবে না, অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং নৌবাহিনীর আয়তনও সীমিত করা হবে।

(ঠ) রাষ্ট্রের অর্থনীতি মিত্রশক্তি কর্তৃক নিয়োজিত কমিশনের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(ড) ক্যাপিচুলেশন প্রথার সাথে আরো ক্ষতিকর দিক সন্নিবেশ করা হয়।

(ঢ) এছাড়াও তুরস্কে বসবাসকারী বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে তুরস্কের উপর বেশ কয়েকটি অপমানকর শর্ত আরোপ করা হয়।[২৫]

সেভার্স চুক্তির শর্তাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটা ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য চরম আঘাতস্বরূপ। এ চুক্তি উসমানীয় সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করে বন্দী ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। তবে এ চুক্তি প্রকাশিত হওয়ার পর তুর্কি জনগণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেই দেশ ও জাতির মুক্তির একমাত্র পথ মনে করে দলে দলে আন্দোলনে যোগদান করে।[২৬]

লুজান চুক্তির পটভূমি

মুস্তফা কামাল সেভার্স চুক্তি অমান্য করে জাতীয় গৌরব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে কামালের নেতৃত্বে তুর্কি বাহিনী সাকারিয়ার যুদ্ধে গ্রিকদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে কামাল অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন এবং "গাজী" উপাধি লাভ করেন।[২৭] অতঃপর ১৯২২ সালের ২৬ আগস্ট তুর্কি সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণে গ্রিকরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং স্মার্ণায় পালিয়ে যায়। ধাওয়া করা তুর্কি বাহিনী ৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিম আনাতোলিয়া মুক্ত করে।[২৮]

পশ্চিম আনাতোলিয়া অধিকার করে তুর্কি বাহিনী একদিকে দার্দানেলিস প্রণালী এবং অন্যদিকে কন্সট্যান্টিনোপলের দিক অগ্রসর হলে মিত্রশক্তির টনক নড়ে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ যেকোন মূল্যে দার্দানেলিস প্রণালী ও কন্সট্যান্টিনোপল প্রতিরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডে লয়েড জর্জের বৈদেশিক নীতি তীব্রভাবে সমালোচিত হতে থাকে এবং তার কোয়ালিশন পার্টির পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কিন্তু পতনের আগে লয়েড জর্জের সরকার ১৯২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মুদানিয়ায় একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে।[২৯] চুক্তির বিধান অনুসারে ব্রিটিশরা থ্রেসে গ্রিকদের নিরস্ত্র করার এবং দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যেগ নেয়।[৩০]

মুদানিয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির অব্যবহিত পরেই জাতীয়তাবাদী সরকার উসমানীয় সালতানাতকে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে। ১৯২২ সালের ১ নভেম্বর জাতীয় মহাসংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ষ্ঠ মুহম্মদ ওয়াহিদউদ্দিন উসমানীয় সাম্রাজ্যের সুলতান হিসেবে পদত্যাগ করেন এবং ব্রিটিশ বাহিনীর সহায়তায় কন্সট্যান্টিনোপল ত্যাগ করেন।[৩১] তার পদত্যাগে ছয় শতাব্দীর অধিককাল (১২৮৮-১৯২২) স্থায়ী উসমানীয় সালতানাতের অবসান ঘটে। জাতীয় মহাসংসদ উসমানীয় বংশের আবদুল মজিদ এফেন্দিকে শুধু খলিফা বলে ঘোষণা করে।[৩২]

লুজান শান্তি সম্মেলন ও চুক্তি

মুদানিয়ার যুদ্ধ বিরতির পর উভয় পক্ষই একটি নতুন শান্তি চুক্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মিত্রপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, নুতন তুর্কি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে একটি নতুন শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন। ফলে ১৯২২ সালের ২০ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা হ্রদের পাশে অবস্থিত লুজানে শান্তি সম্মেলন শুরু হয়।[৩৩] এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, গ্রিস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং জাতীয়তাবাদী তুরস্ক অংশগ্রহণ করে। রাশিয়া শুরুতে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু পরে কন্সট্যান্টিনোপল এবং প্রণালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণের অনুমতি পায়।[৩৪] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষক হিসেবে সম্মেলনে যোগ দেয়।[৩৫] ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা লর্ড কার্জন এবং তুরস্কের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসমত পাশা ইনোনু নতুন তুরস্কের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন।[৩৬] কিন্তু দুই পক্ষের দাবি-দাওয়ার মধ্যে পার্থক্য এত বেশি ছিল যে, সম্মেলনের সাফল্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ইসমত পাশা তুরস্কের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এবং লর্ড কার্জন ব্রিটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।[৩৭] দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মতানৈক্যের কারণে ১৯২৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অমীমাংসিতভাবে সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়।

১৯২৩ সালের ২৩ এপ্রিল লুজান সম্মেলন পুনরায় শুরু হয়। এবার লর্ড কার্জনের অনুপস্থিতিতে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন কন্সট্যান্টিনোপলে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত রামবোল্ড। এবারও ইসমত পাশা নতুন সম্মানজনক চুক্তির বিষয়ে জোরালো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তিন মাসের দীর্ঘ আলোচনা শেষে ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই লুজান বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসজ্জিত মিলনায়তনে মিত্রশক্তি ও তুরস্ক সরকারের

মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৩৮] লুজান চুক্তি সম্পাদনে তুরস্কের প্রতিনিধি এবং মুস্তফা কামাল পাশার ঘনিষ্ঠ সহচর ইসমত পাশা ইনোনুর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লুজান চুক্তির শর্তাবলি

লুজান চুক্তির ধারা ছিল মোট ১৪৩টি।[৩৯] চুক্তির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তুরস্কের রাজনৈতিক ভূখন্ডগত সীমানা, সার্বভৌমত্ব ও সামরিক বিষয়াবলির সম্মানজনক সমাধান। লুজান চুক্তির প্রধান শর্তাবলি নিম্নরূপ:

(ক) তুর্কি বংশোদ্ভূত জনগণের বাসস্থান আনাতোলিয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অখন্ডতা স্বীকৃত হয়।

(খ) মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক ও জর্ডান) এবং প্যালেস্টাইন তুরস্ক থেকে কেড়ে নেওয়া হয় (পরে উভয়ই ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে পরিণত হয়)।

(গ) সিরিয়া তুরস্ক থেকে স্বাধীন হয় (এটি পরে ফরাসি ম্যান্ডেটে পরিণত হয়)।

(ঘ) আরব দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে।

(ঙ) স্মার্ণা তুরস্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে স্বীকৃত হয়।

(চ) আর্মেনিয়ার ব্যাপারে কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি।

(ছ) ইমব্রস ও তেনেদস দ্বীপ তুরস্ককে দেয়া হয়। তবে ইজিয়ান সাগরের অন্যান্য দ্বীপে গ্রিসের এবং দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালির দাবি বলবৎ থাকবে।

(জ) মারিৎজা নদী ও তার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত কারাগাচ শহর পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব থ্রেসের উপর তুরস্কের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়।

(ঝ) তুরস্ক-ইরাক সীমান্ত ইরাকের উপর ম্যান্ডেট ক্ষমতাধারী ব্রিটেন ও তুরস্কের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে এবং প্রয়োজনবোধে লীগ অব নেশন্স-এর হস্তক্ষেপে স্থির হবে। ততদিন মসুল ইরাকের অধীনে থাকবে।

(ঞ) লিবিয়া, মিশর ও সুদানের উপর তুরস্ক অধিপত্য পরিত্যাগ করে।

(ট) সাইপ্রাস ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

(ঠ) তুরস্কে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

(ড) ক্যাপিচুলেশন প্রথা বাতিল করা হয়।

(ঢ) অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশসমূহের কর্তৃত্ব থেকে তুরস্ক মুক্তি লাভ করে।

(ণ) তুরস্কের কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।

(ত) তুরস্কের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না।

(থ) প্রণালীদ্বয়ের উপর আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে তুরস্ক বাধ্য হয়। তবে কয়েকটি ধারা সম্বলিত একটি উপচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

(দ) প্রণালীগুলোর উপকূলীয় এলাকা নিরস্ত্রীকরণ করা হলেও তুরস্কের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।

(ধ) তুরস্কে বসবাসকারী গ্রিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং গ্রিসে বসবাসকারী তুর্কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আবশ্যিকভাবে স্থানান্তরিত করার উপচুক্তিও লুজান চুক্তির মধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়। এতে প্রায় ১৫ লক্ষ গ্রিক ও ৫ লক্ষ তুর্কিকে স্থানান্তরিত করা হয়।[৪০]

বস্তুত: লুজান চুক্তির ফলে তুরস্ক তার হৃত সার্বভৌমত্ব ফিরে পায় এবং তুরস্কের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে তুরস্ক তার হারানো কিছু অঞ্চলের মালিকানা লাভ করে, বিনিময়ে তাকেও কিছু কিছু অঞ্চল ছাড় দিতে হয়। লুজান চুক্তির শর্তাবলি অনুসারে মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের জাতীয় চুক্তি ও স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।[৪১]

সেভার্স ও লুজান চুক্তির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

(১) সেভার্স চুক্তি সত্যিকারার্থে কোন চুক্তি নয় - একতরফা চাপিয়ে দেয়া কতকগুলো অপমানজনক শর্তসমষ্টি। পক্ষান্তরে, লুজান চুক্তি ছিল উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত চুক্তি।

(২) সেভার্স চুক্তি বিপ্লবী তুরস্কবাসী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে; পক্ষান্তরে, লুজান চুক্তি তারা সাদরে গ্রহণ করে।

(৩) মিত্রশক্তি কর্তৃক একতরফাভাবে সেভার্স চুক্তির শর্তাবলি গৃহীত হয়, যা ছিল স্বদেশের মাটিতে বিদেশি শোষণ, কিন্তু লুজান চুক্তি ছিল শোষিত তুর্কিবাসীর দাবি আদায়ের চুক্তি।

(৪) সেভার্স চুক্তি ছিল সুলতানি সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত শেষ চুক্তি আর লুজান চুক্তি ছিল জাতীয়তাবাদী সরকার স্বাক্ষরিত ও মিত্রশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি।

(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ যখন একের পর এক পরাজিত শক্তিগুলোর উপর ইচ্ছামতো চুক্তি চাপিয়ে দিচ্ছিল, সেভার্স চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক ছিল তার অন্যতম শিকার। পক্ষান্তরে, লুজান চুক্তি ছিল তার প্রথম সার্থক প্রতিবাদ।

(৬) সেভার্স চুক্তি দ্বারা তুরস্কের সার্বভৌমত্ব বিলীন হয়ে যায় আর লুজান চুক্তি দ্বারা তুর্কি জাতি তা কেবলমাত্র ছিনিয়ে আনেনি, বরং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করে।

(৭) সেভার্স চুক্তিতে ক্যাপিচুলেশন প্রথা বহাল রাখা হয় আরো কঠিন চুক্তিতে, কিন্তু লুজান চুক্তির দ্বারা তা বাতিল করা হয়।

(৮) সেভার্স চুক্তির ফলে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য খন্ড বিখন্ড হয়ে যায় এবং তুরস্ককে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হয়। পক্ষান্তরে, লুজান চুক্তির দ্বারা তুরস্ক কন্সট্যান্টিনোপল, আদ্রিয়ানোপল ও পূর্ব থ্রেস ফিরে পায়।[৪২] লুজান চুক্তির মাধ্যমে তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা এভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছিল।

(৯) বিচার, সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এতদিন তুরস্কের সার্বভৌমত্বের অপমান করে যে ধরনের কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল, লুজান চুক্তিতে তার অবসানে তুরস্কের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তুর্কি জাতি তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।[৪৩]

(১০) জার্মানির ভার্সাই সন্ধির মতো সেভার্স চুক্তি তুরস্কের সার্বভৌমত্বের প্রতি চরম আঘাতস্বরূপ হলেও এর একটি পরোক্ষ সুফল ছিল, যা তুর্কি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলাফল প্রকাশিত হয় লুজান চুক্তিতে।

(১১) সেভার্স চুক্তি ছিল তুরস্কের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে, লুজান চুক্তি ছিল তুরস্কের জন্য এক মহা বিজয় এবং সেভার্স চুক্তির ক্ষতিপূরণস্বরূপ। লুজান চুক্তি পরীক্ষাকারী কয়েকজন সাংবাদিক এটিকে ইউরোপের উপর এশিয়ার বিজয় বলে অভিহিত করেন।[৪৪]

(১২) সেভার্স চুক্তি ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য ও ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা, কিন্তু লুজান চুক্তি ছিল পুরাতন ভাবধারা পরিত্যাগ করে নতুন তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের পথে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। লুজান চুক্তি সম্পাদনের পর ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ উসমানীয় খিলাফতেরও অবসান ঘটানো হয়।[৪৫] ধর্মভিত্তিক খিলাফতের স্থলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার

আলোচনা শেষে বলা যায় যে, সেভার্স চুক্তি ছিল একটি গ্লানিকর চুক্তি, যার মাধ্যমে তুরস্ককে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেবার একটি হীন চক্রান্ত করা হয়েছিল। তুরস্কের জাতীয়তাবাদী শক্তি তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের মাধ্যমে সে চক্রান্তকে বানচাল করতে সক্ষম হয় লুজান চুক্তির দ্বারা। লুজান চুক্তি ছিল সত্যিকারের শান্তি চুক্তি যা উন্নয়নের পথরুদ্ধ তুরস্ককে উন্নতি ও প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং তার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ নতুন তুর্কি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু নতুন তুরস্ক প্রজাতন্ত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস : অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১), পৃ. ৭০।

২ *তদেব*, পৃ. ৭৩।

৩ দ্রষ্টব্য : https://openai.com/index/chatgpt (লগইন তারিখ : ০১.০৫.২০২৫)।

৪ দ্রষ্টব্য : https://openai.com/index/chatgpt (লগইন তারিখ : ০২.০৫.২০২৫)।

৫ এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

৬ Lord Eversley, *The Turkish Empire: Its Growth and Decay* (Lahore: Premier Book House, 1917, Third Impression, 1959), p. 408.

৭ Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey* (London: Oxford University Press, 1961, Reprinted 1962, Second Edition, 1968), p. 239.

৮ Lord Eversley, *op.cit.*, p. 410.

৯ Bernard Lewis, *op.cit.*, p. 239.

১০ *Ibid.*; Sydney Nettleton Fisher, *The Middle East : A History* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1960), p. 373.

১১ Bernard Lewis, *op.cit.*, p. 239.

১২ সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (প্রথম খন্ড) (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ. ১৪৪।

১৩ এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯।

১৪ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: গ্লোব লাইবেরী (প্রা.) লিমিটেড, ১৯৮৮), পৃ. ১২৯।

১৫ সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

১৬ কে. আলী, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস* (ঢাকা: আলী পাবলিকেশনস, ১৯৬৫), পৃ. ১৪২।

১৭ *তদেব*; সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।।

১৮ কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

১৯ সান রেমো (San Remo) ইতালির উত্তর-পশ্চিমে লিগুরিয়া উপকূলের এক সুন্দর শহর। দ্রষ্টব্য: https://en.wikipedia.org (লগইন তারিখ: ০৬.০৫.২০২৫)।

২০ Lord Eversley, *op.cit.*, pp. 418-419; M. Philips Price, *A History of Turkey : From Empire to Republic* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1961), p. 100; মুহম্মদ আলী আসগর খান, *আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস (১৯১৯-১৯৮০)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৯৬।

২১ এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০।

২২ মুহম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

২৩ Lord Eversley, *op.cit.*, p. 419; M. Philips Price, *op.cit.*, p. 100.

২৪ দ্রষ্টব্য : https://www.nustudents.com (লগইন তারিখ: ০৬.০৫.২০২৫)।

[২৫] সেভার্স চুক্তির শর্তাবলির জন্য দ্রষ্টব্য: J.C. Hurewitz, *Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record: 1914-1956* (New York: D. Van Nostrand Company, INC., 1956, Reprinted, 1958), Vol. II, pp. 81-87; সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২-১৫৪; মুহম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭-৯৮।

[২৬] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

[২৭] কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।

[২৮] Lord Eversley, *op.cit.*, p. 422.

[২৯] *Ibid*.; M. Philips Price, *op.cit.*, p. 122.

[৩০] *Ibid*.

[৩১] এ বি এম হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

[৩২] মুহম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[৩৩] Bernard Lewis, *op.cit.*, p. 254; সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯-১৬০।

[৩৪] Lord Eversley, *op.cit.*, p. 422.

[৩৫] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

[৩৬] Lord Eversley, *op.cit.*, p. 422.

[৩৭] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

[৩৮] *তদেব*; Bernard Lewis, *op.cit.*, p. 254.

[৩৯] দ্রষ্টব্য : https://www.nustudents.com (লগইন তারিখ : ০৭.০৫.২০২৫)।

[৪০] লুজান চুক্তির শর্তাবলির জন্য দ্রষ্টব্য: J.C. Hurewitz, *op.cit.*, pp. 119-127; Lord Eversley, *op.cit.*, p. 423; সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১-১৬২।

[৪১] মুহম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

[৪২] M. Philips Price, *op.cit.*, p. 123.

[৪৩] সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।

[৪৪] মুহম্মদ আলী আসগর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

[৪৫] *তদেব*, পৃ. ১৪৪, ১৪৯; সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬, ১৬৯।